OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 290 - 294
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 290 - 294
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উনিশ শতকের অন্দরমহল ও রাসসুন্দরী দাসীর ‘আমার জীবন’ : আত্মপ্রকাশের ভাষা অনুসন্ধান

সন্দীপ ঘোষ
Email ID: sandipghosh9851@gmail.com
0009-0004-3943-6730

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Autobiography, Andarmahal, Women’s education, 19th century, Social Taboo.

Abstract
While nineteenth-century Bengali society was being illuminated by the dawn of the Renaissance, the lives of women in the andarmahal remained shrouded in the darkness of rigid customs and illiteracy. Emerging from this secluded space, Rashsundari Dasi’s ‘Amar Jiban’ stands not only as the first full-fledged autobiography in Bengali literature but also as a unique testament to the female psyche.

This research paper explores how an ordinary housewife, though crushed by the relentless grind of domesticity, discovered her ‘language of existence’ through the hard-won acquisition of literacy. In this context, ‘language’ signifies more than just the alphabet; it serves as a profound medium of self-identity. By examining the conflicts between socio-cultural norms, religious faith, and personal aspirations, this essay analyzes how Rashsundari Devi’s narrative transcends the domestic limitations of the nineteenth century to achieve universal significance.

Discussion

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রাসসুন্দরী দাসীর রচিত ‘আমার জীবন’ এক আশ্চর্য নির্মাণ। গ্রন্থটি আত্মস্মৃতি কথার প্রথম গৌরব অর্জন করেছে বলতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করি না। আমরা জানি রাসুন্দরী দাসী কখনো স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করেননি বা পুথিগত শিক্ষা অর্জন করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তিনি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে এরকম সুললিত গদ্যে আত্মজীবনী গ্রন্থ রচনা করে আমাদের বিস্ময় করেন। এটা বলাই যায় তিনিই প্রথম আত্মজীবনী রচনার একটা পরিকাঠামোর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। ইংরাজিতে যাকে বলি ‘Autobiography’ বাংলাতে তাই হল ‘আত্মজীবনী’। যখন কোন ব্যক্তি সুললিত ভাষায় নিজের কথা বর্ণনা করেন তখন তাকে আমরা ‘আত্মজীবনীমূলক’ গ্রন্থ বলি।

এবার সহজেই আমাদের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগে যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও তো বিভিন্ন ধারায় কবিরা তাদের কাব্যে নিজেদের কথা বর্ণনা করে গেছেন আত্মবিবরণী অংশে। মুকুন্দ চক্রবর্তী, মালাধর বসু, কাশীরাম দাস, আরও অনেকে। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে এগুলোকে ঠিক আত্মজীবনী কখনোই বলা যায় না। কারণ কবিরা তাদের নিজেদের কিছু কথা কাব্যে তুলে ধরলেও তা পরিপূর্ণ নয়। তাছাড়া নিজেদের জীবনকাহিনি লেখার উদ্দেশ্যেও কাব্যগুলি রচিত হয়নি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 290 - 294
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল দেবদেবী মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কাহিনি বর্ণনা করা। লিখতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের কিছু কথা অবশ্যই লিখে যেতেন। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই লেখাগুলিকে কখনোই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ বলা যায় না। তাছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের জীবনী নিয়েও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনীকাব্য রচিত হয়েছে। তবে সেটা জীবনীকাব্য, আত্মজীবনী কাব্য নয়। জীবনীকাব্য হল অন্য কারোর জীবন কাহিনি লেখা আর আত্মজীবনী হল নিজের জীবন কাহিনি নিজে লেখা। আসলে সেই সময়কালে দাঁড়িয়ে আত্মজীবনী লেখার কথা কেও কল্পনাও করেননি। আসল কথা আত্মজীবনী লেখার কোনো রীতি তখন তৈরীই হয়নি। শুধুমাত্র কাব্য লিখতে গিয়ে নিজেদের সংক্ষিপ্ত তথ্য বা পরিচয়টুকু দিয়ে গেছেন। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আমরা তাকেই বলবো যেখানে একজন ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ জীবনকাহিনি লিখবে এবং সেই জীবনী শোনানোটাই তার উদ্দেশ্য হবে।

এই ধারার প্রচলন হল উনিশ শতকে। হয়তো বাঙালির মধ্যে নিজেদের জীবনের ভালো-মন্দ সবরকম কার্যকলাপ এবং চিন্তাধারা প্রকাশের ইচ্ছা তেমনভাবে ছিলনা। এবং কারোর আত্মজীবনী পড়ার মতো পাঠকও ছিলনা, তাই এতদিন লেখা হয়নি। তবে সহজেই এই প্রশ্ন জাগে দীর্ঘ এত বছর পর এই ধারার প্রচলন কেন? তার প্রধান কারণ হিসাবে অনেক গবেষকই ইংরেজ ও ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব বলেই মনে করেছেন। সেক্ষেত্রে এই প্রশ্ন থেকেই যায় যে বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীর লেখক তাহলে কোনো ইংরাজি প্রভাবিত নব্য বাঙালি নয় কেন?

বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লিখলেন গ্রামবাংলার প্রায় অশিক্ষিত একজন মহিলা রাসসুন্দরী দাসী। অর্থাৎ আত্মস্মৃতি কথা রচনার একটা দৃষ্টান্ত তিনিই স্থাপন করে গেছেন। তার দেখানো পথ ধরেই পরবর্তীকালে আমরা এমন অনেক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ পাচ্ছি। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি'। এজন্যই দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন –

> "এই গ্রন্থখানি একজন রমণীর লেখা। শুধু তাহা নহে, ৮৮ বৎসরের একজন বর্ষিয়সী প্রাচীনা রমণীর লেখা। তাই বিশেষ কুতূহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিলাম যেখানে কোনও ভাল কথা পাইব সেইখানে পেনসিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি, পেনসিলের দাগে গ্রন্থকলেবর ভরিয়া গেল। বস্তুত ইঁহার জীবনের ঘটনাবলী এমন বিস্ময়কর এবং ইহার লেখায় এমন একটি অকৃত্রিম সরল মাধুর্য আছে যে, গ্রন্থখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া থাকা যায় না।"[১]

রাসসুন্দরী দাসী ছিলেন গ্রাম বাংলার সাধারণ একজন নারী। গ্রন্থটিতে তিনি শুধুমাত্র যে নিজের কথা বলেছেন তা নয় তৎকালীন গ্রাম্য সমাজের নারীদের অবস্থা কেমন ছিল সেটাও দেখিয়েছেন। 'আমার জীবন' পড়লে আমরা ওই সময়ের নারীদের জীবনচর্চা কেমন ছিল তা জানতে পারি। তবে এই গ্রন্থটি না লেখা হলে হয়তো বাংলা সাহিত্যের একটা অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যেত। কারণ সেই সময়ে একজন নারীর কলমে নারীদের কথা যেভাবে উঠেছে তা হয়তো অন্য কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বর্তমানে পাবনা জেলার কাছে পোতাজিয়া নামক একটি গ্রামে ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন রাসসুন্দরী দাসী। ১৮০৯ থেকে ৮৮ বছর বয়স অব্দি তার জীবনকাহিনিকে তিনি খুব সযত্নে একটু একটু করে লিখে রেখে গেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। আমাদের মনে রাখতে হবে সময়টা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। নারী শিক্ষার জন্য সমাজে তখন লড়াই চলছে তবে তার প্রভাব গ্রামে তখনও ততটা পড়েনি। এটা মনে রাখতে হবে উনিশ শতকের এই সময়টিতে সমাজ সংস্কারকেরা মহিলাদের স্বাধিনতা ও উন্নতির জন্য যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন তা কিন্তু এই গ্রাম্য মহিলাদের জন্য নয়। তা ছিল কলকাতা শহরের ব্রাহ্ম বা হিন্দু মহিলাদের জন্য।

সেকালে নারীদের পড়াশোনার অধিকার ছিল না। শুধু অধিকার ছিল না বললে ভুল হবে। নারীরা লেখাপড়া শিখলে সংসার রসাতলে যাবে, অচিরেই বিধবা হবে, তাছাড়া যেহেতু তারা আয় করবে না তাই তাদের লেখাপড়া শেখা অর্থহীন ইত্যাদি মত সমাজে প্রচলিত ছিল। সে কথা লেখিকা এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন –

> "আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না। তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেও পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 290 - 294
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভড়ত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাত থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।”[২]

লেখিকার বাড়িতেই একটা বাংলা স্কুল বসত। একজন মেমসাহেব তাদের শেখাতেন। শুধুমাত্র গ্রামের ছেলেরা সেখানে পড়তে আসতো। কারণ মেয়েদের পড়াশোনা করার অধিকার ছিল না। বারবার তাঁর কণ্ঠে তাই মর্মবাণী শোনা গেছে –

> “তখন মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শিখাইত না।”[৩]

তার ব্যতিক্রম ছিলেন তিনি। শৈশব শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল তার বাড়ির পাঠশালাতেই। রান্না বাটি, পুতুল খেলা অন্যান্য মেয়েদের থেকে সরিয়ে তার অভিভাবকরা তাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিত –

> “বাঙ্গালা স্কুল আমাদের বাটীতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটীতেই লেখাপড়া করিত। একজন মেমসাহেব ছিলেন তিনি সকলকে শিখাইতেন। পর দিবস প্রাতে আমার খুড়া আমাকে কালো রঙের একটি ঘাগড়া পরাইয়া একখানা উড়ানী গায়ে দিয়া সেই স্কুলে মেমসাহেবের কাছে বসাইয়া রাখলেন। আমাকে যেখানে বসাইয়া রাখিতেন, আমি সেইখানেই বসিয়া থাকিতাম। ভয়ে আমি আর কোন দিকে নড়িতাম না।”[৪]

তিনি সেখানে বসে বসেই ছেলেদের পড়া শুনে শুনে অ-আ-ক-খ শিখে নিলেন। শিখে নিলেন পারসী ভাষাও –

> “তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈস্বরে পড়িত। আমি সকল সময়ই থাকিতাম। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম। সেকালে পারসী পড়ার প্রাদুর্ভাব ছিল। আমি মনে মনে তাহাও খানিক শিখিলাম।”[৫]

এই অক্ষর জ্ঞান শিক্ষাই তাঁকে পরবর্তীকালে ‘চৈতন্যভাগবত’ পুথি চিনতে সাহায্য করেছিল। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় আজকে নারীরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, সমাজের মহিলারা তখন সেই অবস্থায় ছিলেন না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে সমাজ যে অনেক পাল্টে গেছিল সেটা তার কথাই স্পষ্ট –

> “এখনকার মেয়েছেলেগুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শেখায়। এই লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমাদের কত কষ্ট হইয়াছে। আমি যে যৎকিঞ্চিত শিখিয়াছি, সে কেবল সম্পূর্ণ পরমেশরের অনুগ্রহ মাত্র।”[৬]

সাধারণত মেয়েদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা হয় শ্বশুরবাড়ি। সেসময় বালিকা বধূদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শ্বশুড়বাড়িতে যে কত রকমের অত্যাচার সহ্য করতে হত তা কম বেশি আমাদের সকলের জানা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাসসুন্দরী দেবীকে এসব সহ্য করতে হয়নি। তাঁর শ্বাশুড়ি তাঁকে তাঁর মায়ের মত স্নেহ করেছেন, ভালোবেসেছেন। আবার তাঁর খেলার জন্য অনেক প্রকার খেলনা এনে দিয়েছেন। গ্রামের সব মেয়েদের তাঁর সঙ্গে খেলার জন্য ডেকে দিতেন। বাড়ির কোনো কাজও করতে দিতেন না। এদিক থেকে তিনি ভাগ্যবতী ছিলেন। তাই তাঁর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাঁর শ্বশুড়বাড়ি কখনই প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু তাঁর প্রবল শেখার আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও যেটা তাঁর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হল লোকভয়। কে কি বলবে? কে কখন দেখে ফেলবে, এই ভয়ে নারীর জীবন জর্জরিত ছিল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদিও সেই পরিস্থিতি অনুভব করা খুবই কঠিন। সেই কথা তিনি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন –

> “আমার মনের কথা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, কেহ জানিবে বলিয়া ভয়ে প্রাণ কাঁপিত। এমনকি, যদি একখানি লেখা কাগজ দেখিতাম, তাহাও লোকের সম্মখে তাকাইয়া দেখিতাম না। পাছে কেহ বলে যে, লেখাপড়া শিখিবার জন্যই দেখিতেছি।”[৭]

তবে শেখার অদম্য ইচ্ছা এবং অনুকূল পরিবেশের জন্য শেষ পর্যন্ত রাসসুন্দরী দাসী লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 290 - 294
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাব্য, গল্প, উপন্যাস সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই প্রায়শই দেখা যায় লেখকরা নারীর একটা দিক আঁকেন প্রেমকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এখানে রাসসুন্দরী দাসী তাঁর জীবনের সব কথা বললেও প্রেমের দিকটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। সেকালে বিয়ে করার ক্ষেত্রে নারীদের কোনো স্বাধীন মত ছিল না। তাদের কোনো রোম্যান্টিক অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাদের বিয়েই হত খুবই অল্প বয়সে যখন তাঁরা প্রেম ও বিয়ের অর্থই বুঝত না –

> "সকলেরি বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি, তাহা আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না, বিবাহ হয় এই মাত্র জানি।"[৮]

অর্থাৎ দশ-বারো বছর বয়সে সেইসময় মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। ফলে খুব অল্প বয়সে তাদের জীবনটাই পাল্টে যেত। এককথায় খেলাধূলার জীবন থেকে হঠাৎ সংসার জীবনে এসে পরত। বন্ধুদের সঙ্গে খেলার জীবন থেকে এসে পরতো শ্বাশুড়ি, ননদের কড়া নজরে। সেজন্যই হয়তো মেয়েরা বাবার বাড়িকে 'নিজের বাড়ি' এবং শ্বশুড়বাড়িকে 'পরের বাড়ি' বলত। সেই কষ্টের কথা বোঝাতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন –

> "যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময় সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।"[৯]

রাসসুন্দরী দেবীরও শ্বশুড়বাড়িকে পরাধীন বলে মনে হলেও প্রকৃত অর্থে তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়েছে শ্বশুরবাড়িতেই। তাঁর স্বামী একবার চৈতন্যভাগবতের পুথি বাড়িতে রেখে গেলেন। যেহেতু সেইসময় দিনের বেলায় পুরুষের অন্তঃপুরে যাওয়া নিষেধ ছিল। স্ত্রীর মুখ দেখাও নিষেধ ছিল তাই ছেলেকে যত্ন করে রেখে দিতে বলে বাইরেই নামিয়ে দিয়ে গেলেন। সেই পুথি থেকেই একটা পাতা খুলে নিয়ে রান্নাঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। কারণ তাঁর হাতে পুথির পাতা দেখলে সকলে নিন্দা করবে বলেই মনে হয়েছে তাঁর। এইভাবেই লেখিকার পড়ার শুরু। পরবর্তী সময়ে দেখেছি তিনিই বলেছেন ঐ বাড়িতে যা যা বই ছিল একসময় তিনি সেসব পড়ে ফেলেছিলেন। এবং একটু একটু করে লিখতেও শিখেছিলেন। তার ফল হিসাবে আমরা অমূল্য এই গ্রন্থখানি পাচ্ছি।

রাসসুন্দরী দাসীর শুধুমাত্র পড়াশোনাতেই প্রতিভা ছিল তা নয়। আমরা আগেই জেনেছি শ্বাশুড়ি বেঁচে থাকতে শ্বশুড়বাড়িতে রাসসুন্দরী দেবীকে কোনো কাজ করতে হত না। তাই কোনো কাজ না পেয়ে কড়ি দিয়ে নানা রকমের জিনিস তৈরি করতে শুরু করেন তিনি। ঝাড়, পদ্ম, আলনা, ছিকা। তাছাড়া মাটি দিয়ে কুকুর, সাপ, বাঘ, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি। একবার তাঁর বানানো মাটির সাপ দেখে সকল সত্যি ভেবে ভয় খেয়েছিল। অর্থাৎ এইকাজে যে তিনি পটু ছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল সেটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু অদ্ভুত বিষয় এটাই যে তাঁর বানানো জিনিস দেখে লোকের এত উৎসাহ দেখে আর সেই কাজে প্রবৃত্তি হলেন না ঐ লোক লজ্জার ভয়ে।

খুব কম বয়সে তার বিবাহ হয়েছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শাশুড়ির মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল তাকেই। তাই সংসার করতে গিয়ে অনেক সামাজিক আচারের কথাও তিনি বলেছেন। সেসময় চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা মোটা কাপড় পরে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে বাড়ির কাজ করতে হত। কোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে পারত না। কোন কারণে ঘোমটা তুলে বাইরে দৃষ্টি দেবার নিয়ম ছিল না –

> "কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না, এই প্রকার সকল বিষয়ে বৌদিগের কর্ম্মের রীতি ছিল। আমি ঐ রীতি মতোই চলতাম।"[১০]

অর্থাৎ সেই সময় নতুন বৌদের জন্য পর্দাপ্রথার যে কড়াকড়ি ছিল এবং অতিরিক্ত অনাবশ্যক লজ্জার বাড়াবাড়ি ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।

তাছাড়া বিয়ের পর শ্বশুড়বাড়িতে মেয়েদের যে কত কাজ করতে হয়, কত কর্তব্য পালন করতে হয়, কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয় সে সব কথাও তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 38
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 290 - 294
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "আমি প্রাতঃকাল হইতে ঐ সমুদয় কাজ করিতে আরম্ভ করিতাম, রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত কাজের শেষ হইত। ইতিমধ্যে আমার বিশ্রাম ছিল না।"[১১]

বাড়ির কাজ, স্বামীর খাওয়া, বাড়ির অন্যদের সেবা যত্ন সবশেষে নিজের ছেলেমেয়েগুলির দেখাশোনা করতে গিয়ে কোনো কোনো দিন তাঁর খাওয়া জোটে নি সেকথাও তিনি বলেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও এসব নিয়ে তাঁর মধ্যে কোন আক্ষেপ বা অভিযোগ দেখা যায় না। আক্ষেপ ছিল একটাই যে তিনি পড়তে পারছেন না। সে আক্ষেপ তাঁর পূরণ হয়েছিল।

তবে একথাও ঠিক সমকালের মেয়েদের ছবি এই গ্রন্থে উঠে এলেও তা সম্পূর্ণ ছবি নয়। সেইসময় এর থেকে অনেক বেশি নির্যাতন হত মেয়েদের উপর। যেহেতু তাঁর স্বামী এবং শ্বশুড়বাড়ির লোকজন ভালো ছিল, অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল তাই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি লেখিকাকে। তা সত্ত্বেও একজন নারীর কলমে যে ভাবে নারীর মনের কথা, অন্তঃপুরের কথা উঠে এল তা সত্যি বিস্ময়কর। তবে তিনি কখনই সাহিত্য রচনার কোন দৃষ্টান্ত রেখে যাবার জন্য লেখেন নি বা তাঁর কাজের জন্য কোন কৃতিত্বের দাবি করেননি। আপন মনের টানে নিজের জীবনের কথা লিখে রেখে গেছেন মাত্র। তাই নিজের অজান্তেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম আত্মজীবনী লিখে অমরত্বের দাবি রেখে গেছেন তিনি।

Reference:

১. দাসী, রাসসুন্দরী, *আমার জীবন,* প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ, ১৮৭৬, কলকাতা, পৃ. ১৩
২. তদেব, পৃ. ৫৭
৩. তদেব, পৃ. ৫৪
৪. তদেব, পৃ. ৩৯
৫. তদেব, পৃ. ৪০
৬. তদেব, পৃ. ৬৫
৭. তদেব, পৃ. ৫৭
৮. তদেব, পৃ. ৪৮
৯. তদেব, পৃ. ৪৯
১০. তদেব, পৃ. ৫৫
১১. তদেব, পৃ. ৫৭